MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ফেব্রুয়ারি ২০২১
দাম : দশ টাকা

উন্নয়নের নামে দেশ আজ পুঁজিপতিদের লুটপাটের মৃগয়াক্ষেত্র কমরেড খালেকুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত, দেশ চলছে কর্তৃত্ববাদী শাসনে

[৮ ও ৯ জানুয়ারি '২১ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ৬ নং জোনের শিক্ষাশিবির ৮/৪-এ সেগুনবাগিচা ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জোন সমন্বয়ক নিখিল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষাশিবিরে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, আরও বক্তব্য রাখেন ৬ নং জোন ইনচার্জ কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও জোনাল ফোরামের নেতৃবৃন্দ। শিক্ষাশিবিরে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দেয়া কমরেড খালেকুজ্জামানের বক্তব্য নিচে ছাপা হলো–সম্পাদক]

স্বাধীনতাত্তোর ৫০ বছরে দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও রাজনীতি নানা ধরনের হোঁচট খেয়ে অগ্রসর হয়েছে। এ সময়কালে বুর্জোয়ারা নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল খুনাখুনি, হত্যা-সহিংস কার্যকলাপ সংগঠিত করে এখন একটা একটানা কর্তৃত্ববাদী স্থিতিশীল জায়গা ধরে রাখতে তৎপর রয়েছে। ফলে জনগণের দুঃসহ জীবনের নিংড়ানো শ্রমে পুঁজিবাদী বিকাশটা অব্যাহত আছে। অতীতে সামরিক শাসক এরশাদের ৯ বছর ছাড়া শাসন ক্ষমতা একটানা ধারাবাহিক ছিল না, আওয়ামী লীগ এখন ১২ বছর ধরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে। তারা ভোটব্যবস্থাকে চরম বিতর্কিত ও অকার্যকর করেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুঁজিপতিদের আস্থা-ভরসা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পেরেছে এবং এটা দেখাতে পেরেছে যে, তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দেশি-বিদেশি পুঁজির সুরক্ষা দিতে সক্ষম। অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারছে না। দেশ চালাতে গিয়ে সরকার আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে দেশি পুঁজির সংযোগ স্থাপন করতে (গাঁটছড়া বাধতে) সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানি ২২ পরিবারের জায়গায় দেশে এখন ৩৬টা পরিবারকে কেন্দ্র করে কয়েক লক্ষ পুঁজিপতি একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে তাদের বিনিয়োগ নিরাপদ হয়েছে, যোগাযোগ ও বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে।

শিল্প মালিকদের পুঁজি বিনিয়োগের জন্য ১০০টা অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিক পুঁজির আগমন অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদকে আরও শক্তি জোগাবে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পুঁজিও দেশীয় সস্তা শ্রম শোষণে মুনাফার পাল্লা ভারী করতে পারবে এবং মুনাফা লুটে নিতে পারবে।

দেশের বড় অবকাঠামোগত উন্নয়ন মূলত : ভারতকেন্দ্রিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করবে। বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণির লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ শক্তিশালী জাতীয় বিকাশের চেয়েও আন্তর্জাতিক পুঁজির জুনিয়র অংশীদার হিসেবে ফটকা পুঁজির লাভ ও কমিশন পাওয়ার দিকটাই প্রধান। যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে বাহিরের বাজার ধরা সহজ হবে। তৈরি পোশাক, ওষুধ, চামড়া, সবজি, পাটজাতপণ্যসহ আরও কিছু রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিমাণ বাড়াবে। দেশের বাজারেও বিদেশি গাড়ি ও গাড়ি ভর্তি মালামাল অবাধে ঢুকবে। তাতে বাণিজ্য ঘাটতি কমবে না বরং বাড়বে।

আমাদের দেশের অদক্ষ সস্তা শ্রমশক্তি বিদেশি শ্রম বাজারে বিক্রি একটা ধাক্কা খেয়েছে করোনার কারণে। অদক্ষতাও একটা কারণ হিসেবে আছে। বিদেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেহেতু নতুন প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে সে কারণেও অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমছে। আমাদের দেশের কৃষি এবং প্রযুক্তির যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে খাদ্য উৎপাদন চার গুণ বেড়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে খাদ্যের নিরাপত্তার ঝুঁকি কমেছে। কিন্তু উৎপাদক কৃষকের চতুর্গুণ সমৃদ্ধি দূরে থাক ঝুঁকি বহুগুণ বেড়েছে। তারা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। ভোক্তাদেরও তাতে কোন লাভ হয় না। একদল মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী; কৃষি উৎপাদনের উপকরণ বীজ-সার, কীটনাশক নিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ীদের সাথে যুক্ত হয়ে এরা ফুলেফেঁপে উঠছে। কৃত্রিম বাজার সংকট সৃষ্টিতে বছরে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা লোপাট হয়। সাধারণ মানুষের আয় সঞ্চয় কমে যায়।

দেশের কৃষি-শিল্প, ব্যবসাসহ সার্বিক অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে। একটা অংশের মানুষ এই বর্ধিত আয়তনের অর্থনীতির সুবিধা ভোগের জন্য রাজনৈতিক দলের পদ-পদবি, অর্থ, জনপ্রতিনিধির ক্ষমতা ব্যবহার করছে। এর বাইরেও সুবিধা নিচ্ছে সরকারি আমলা, পুলিশ-আইনশৃঙ্খলা

রক্ষাকারী বাহিনী ও নানা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ। এদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, তার সাথে নানা কৌশলে উপরি আয় করে এরা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীতে শামিল হয়েছে। দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গেছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এখন বিশ্বাস করে–উন্নয়ন এবং বুর্জোয়া অর্থেও গণতন্ত্র একসাথে চলা সম্ভব না। এটা হয়তো খোলামেলা বলে না কিন্তু তাদের নীতি নির্ধারকরা এ ব্যাপারে একমত। তারা বলে–চীন, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার মতো দেশে প্রচলিত গণতন্ত্র থাকলে অর্থনৈতিক এ উন্নতি হতো না। দেশের প্রশাসন ও শাসনকার্যের সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যেও এ ধারণা গড়ে তুলতে শাসক দল সক্ষম হয়েছে। কোন দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিদ্যমান বাস্তবতা কী তা বিবেচনা না করে কর্তৃত্ববাদে শাসন প্রশাসন একাকার করে ফেলা হয়েছে। ফলে গণতন্ত্র দূরে থাক, ভোটতন্ত্রও রক্ষা করার ধার ধারছে না।

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ যখন প্রায় নিরঙ্কুশ একদলীয় ক্ষমতার অধিকারী সে সময়ও তারা একটা আপেক্ষিক অর্থে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারে নাই। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে অনেকের ধারণা এই রকম যে, বিরোধী ১২ থেকে ১৮ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিল কিন্তু তাদের বিজয়ী হতে দেওয়া হয়নি। ভোটের বাক্সা ঢাকা নিয়ে এসে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণার কথা তখন মানুষের মুখে মুখে ছিল। অর্থাৎ বুর্জোয়ারা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন তাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একপ্রকার নিশ্চিত তখনও গণতন্ত্রের এই সহিষ্ণুতা অর্জন করতে চায়নি বা পারেনি। এই কয়েকজন বিজয়ী হলে কী হতো? বর্তমান যুগে বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিকব্যবস্থা একচেটিয়াকরণের যে প্রবণতা এর থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। এতে তাদের তথাকথিত উন্নয়ন ও অস্তিত্ব বাধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে যখন ঘোষিত একদলীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ বেসামরিক স্বৈরশাসন নীতি চালু হলো, সেটা সহিংস হত্যাকাণ্ডে সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত হলো। ওই সময়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজির সাথে ব্যক্তি পুঁজির, শাসক দলের নিজেদের মধ্যেকার, আন্তর্জাতিক শক্তি বলয়ের মধ্যেকার, রক্ষী বাহিনীর সাথে সামরিক বাহিনীর দ্বন্দ্বসহ অনেক ধরনের দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল ছিল। তারপর, সামরিক স্বৈরাচারী কর্তৃত্বে শাসক দল গঠন করে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৮২-তে আবারও সামরিক শাসন, দল গঠন প্রক্রিয়ায় শাসন চলে। ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে বুর্জোয়া দ্বিদলীয় ব্যবস্থা আসে কিন্তু সেটা কার্যকর করা যায়নি। এখন একদলকেন্দ্রিক বহুদলীয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

গণতন্ত্রের রূপ-চেহারা কেমন; সেটা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি এইসব ধারণার উৎপত্তি ইউরোপে। সাধারণভাবে গণতন্ত্র মানে হলো, মানুষের মুক্তচিন্তা, স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করা ইত্যাদির একটা সমন্বয়। এর সাথে যুক্ত–সকল মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের নিশ্চয়তা। জনগণের এই অধিকারের স্বীকৃতি ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সবটা মিলে গণতন্ত্রের পরিমণ্ডল। এগুলো যদি নিশ্চিত না হয় তা হলে একটা শাসনকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না।

আওয়ামী লীগ যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল সেটাকে পুঁজি করে তারা একটা জাতীয়তাবাদী ভাব-উন্মাদনা তৈরি করেছে। ওই জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ জাগিয়ে ও পরিবারসহ শেখ মুজিবের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুতিকে ভাব-উন্মাদনার পরিবেশ তৈরির কাজে লাগিয়েছে। ১৯৭৫ পরবর্তীতে বিএনপি যে কৌশল নিয়েছিল তার কার্যকারিতা এখন আর তেমন নেই। তাদের সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের কোনঠাসা করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদেরকে প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়ে একটা রাজনৈতিক শূন্যতা বহাল রেখে চলেছে। আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদী ভাব-উন্মাদনার সাথে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এবং লিবারেল ডেমোক্রেটিক শক্তি যুক্ত করে এবং তার সাথে পরাস্ত স্বৈরাচারী এরশাদের জাতীয় পার্টিকে নিয়ে একটি শক্তিবলয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে একটা বড় ধরনের সুবিধা আদায়কারী শক্তি। এই শক্তি একদিকে মৌলবাদী শক্তির সাথে আতাত করছে আবার তাদের সাথে একটা বিরোধও রেখেছে। যেমন, তাবলিগ জামাত যখন একটা শক্তিরূপে দেখা দিল তখন তাদের বিভক্ত করতে ভূমিকা রাখলো। ব্যাপক গণদাবির সাথে জামায়াতে ইসলামকে যুদ্ধাপরাধী বিচারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। যার মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনমত পক্ষে টানতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিসাবে জামাতকে এখনও বেআইনি ঘোষণা করছে না। হেফাজতে ইসলামকে দুই ভাগ করে দুর্বল করে দিয়ে শাহ আহমদ শফীর অনুসারীদের তাদের পক্ষে আনার চেষ্টা করেছে। একদিকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তাদের সাথে আঁতাত করে সুবিধা বিলাচ্ছে আবার তার বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়ছে। সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম দুটোই বহাল রেখে ধর্ম নিরপেক্ষতার ঢোল বাজাচ্ছে। এর মধ্যদিয়ে গদি এবং ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা চলছে। এটা একধরনের রাজনৈতিক চালাকিপূর্ণ জালিয়াতি। এতে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা মার খাচ্ছে, মৌলবাদী ভাবজমিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের প্রশাসন-প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা বলয়ের সঙ্গে একমুখী করে ফেলা হয়েছে। যার ফলে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ও জনসেবা কাজে সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ অকার্যকর, অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

উন্নয়নের নামে যা হচ্ছে তা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উন্নয়ন। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের লুটপাটের মৃগয়াক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। দুর্নীতি আর বৈষম্য পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যে এদের একটা করপোরেট শক্তি তৈরি করে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এ ধারায় বুর্জোয়াদের গড় স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে গ্রুপ স্বার্থের সংঘাত তৈরি হচ্ছে। রাজনৈতিক সংঘাত-সহিংসতা বাড়ছে। আন্তদলীয় কোন্দল সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে, আমলাতন্ত্রের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত বাড়ছে। শাসকশ্রেণি পুঁজিবাদী পন্থায় যে উন্নয়ন

দেখাচ্ছে সেটা নিয়ে লিবারেলদের সমস্যা নেই, সমস্যা হচ্ছে পুরো ব্যবস্থা যে সংকটে পড়বে সে চিন্তায়। তারা এই অবস্থার সংস্কার বা পরিবর্তন চায়। কিন্তু পরিবর্তনটা কীভাবে হবে। বিএনপি এখন যে অবস্থায় আছে তাদের ক্ষমতায় আনার জন্য বুর্জোয়ারা আস্থা পাচ্ছে না। আবার আওয়ামী লীগও নিজেরা কিছুটা সংস্কার ও শুদ্ধি অভিযান চালাবে এটাতেও তারা আস্থা রাখতে পারছে না। সামরিক বাহিনীর ওপরও আস্থার সংকট আছে। সরকারের আন্তর্জাতিক সমস্যা রোহিঙ্গা, আন্তর্জাতিক নদীর পানির নগদ হিস্যা আদায় ইত্যাদিতে বিদেশি আশ্বাস বাহবা ছাড়া ইতিবাচক কোন সমর্থন সহযোগিতা আদায় করতে পারছে না, আবার দেশের মধ্যে গণবিচ্ছিন্ন একচেটিয়াত্ব সব মিলে একটা নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছে।

পুঁজিবাদী দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি, দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনীতির চেহারা উন্মোচিত হচ্ছে। বুর্জোয়ারা প্রতিনিয়ত নীতি আদর্শকে উপহাস এবং খাটো করে ভোগবাদ-প্রয়োজনবাদের যে উৎকট চেহারা তুলে ধরেছে; সেটাতে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। এরা মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা ভ্রান্তি বিলাসী মানসিকতা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। যেমন বলা হচ্ছে–নীতি নিয়ে চলে তো কিছু হচ্ছে না! বরং চলতি হাওয়ায় শামিল হও প্রয়োজন মিটাও। অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির পরিণতি শেষ কথা, ভালোমন্দ, ঠিক বেঠিক পদ্ধতি-প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়। এগুলো শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও প্রভাব ফেলছে।

শাসকদের চরিত্র স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু উন্মোচিত হচ্ছে। যেমন, দিনের ভোট আগের রাতে নিয়ে নেয়া; করোনাকালে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা খাতের দুর্নীতি; বালিশ কাণ্ড থেকে শুরু করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্থ আত্মসাৎ, বিদেশে পাচার কাহিনী মানুষের মুখে মুখে। বলা হচ্ছে দেশে অস্ত্র তৈরি হবে, যুদ্ধ বিমান তৈরি করবে কিন্তু ভারী শিল্প, রেলের ইঞ্জিন-বগি তৈরির কথা নাই। বলা হচ্ছে কাউকে বেকার রাখা হবে না কিন্তু পাটকল-চিনিকল বন্ধ করে কর্মজীবীদের বেকার করে দেয়া হয়েছে। মেগা প্রজেক্টের সাথে চলছে মেগা দুর্নীতি। অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু সেটা কাঠামোগত উন্নয়নের সাথে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তার মূল্যায়ন কী? জনগণের দিক থেকে অর্থনৈতিক বিবেচনায় কোনটা প্রাধান্য দেয়া দরকার তার কোন আলোচনা নেই। দেশের বুদ্ধিজীবীরা এসব বিষয়ে খুব বেশি কথা বলেন না। উপরে উপরে কিছু কথা বলেন কিন্তু মূল জায়গায় হাত দেন না।

সমাজতন্ত্র নিয়ে ভাসাভাসা কথা হচ্ছে। এক সময় কার্ল মার্কসকে পৃথিবীর এক লাখ মানুষও হয়তো চিনতো না। কিন্তু রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ মার্কসবাদ, সামাজতন্ত্রের সাথে পরিচিত হয়েছেন। ফলাফল থেকে মানুষ তাকে যেভাবে গ্রহণ করেছিল বৈজ্ঞানিক সত্যের গভীরতা থেকে তার বিচার হয়নি। সমাজতন্ত্রকে সমাজবিকাশের নিয়ম থেকে এবং আদর্শিকভাবে গভীর বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে বেশির ভাগ মানুষ যেহেতু গ্রহণ করেনি, তাই উপরি সাফল্য থেকে গ্রহণ করা উপরি ব্যর্থতা থেকে বর্জন করার একটা মনোভাব কাজ করছে। এখন এই সংগ্রামটা বেশি প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সমাজতন্ত্র সমাজ বিকাশের ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি সত্ত্বেও কেন ক্ষেত্র বিশেষে ব্যর্থ হলো; সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব-ইউরোপসহ অন্যান্য দেশ ব্যর্থ হলো কেন? এ প্রশ্নের জবাব তো দিতে হবে। মানুষ জানতে চায়। আমাদের সে শিক্ষা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সবার প্রত্যাশা একরকম ছিল না। কারণ আগেও সমাজ শ্রেণিবিভক্ত ছিল। ফলে সাধারণ জনগণ শ্রমজীবী জনগণ চেয়েছিল সার্বিক মুক্তি আর উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণি চেয়েছিল তাদের পুঁজির স্বাধীন বিকাশ ভূমি। এ জন্য জনগণ দেশ স্বাধীন করেছে বুর্জোয়ারা দেশ দখল করেছে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা সে দিন অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না তাই সংবিধানে সে আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি হয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণি তার নিজস্ব বিকাশের স্বার্থে তাৎক্ষণিকভাবে গণপ্রত্যাশার বিরুদ্ধাচরণ না করে কথার অর্থে মেনে নিয়ে তাদের নিজস্ব কায়দায় তারা এগিয়েছে। জনগণের সাম্যের বদলে পুঁজিপতি শ্রেণির বিকাশের পথ তারা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আর্থিক বৈষম্য সামাজিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। এর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আজ স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে আমরা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের চেহারা হারিয়ে হানাদার রাজাকার কবলিত বাংলাদেশের দৃশ্যপটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাচ্ছি।

পুঁজিবাদী বিকাশ ধারায় শ্রমজীবী, নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্তের ওপর একটা অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়। এ অবস্থায় একটা অংশ উপরের দিকে ওঠে যায় বাকিরা ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকে। আগে যারা আদমজীতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো বা বস্তিতে বসবাস করতো তাদের কাজে ও জীবনেও আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা ছিল। এখন ওই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থায় যারা আছে তাদের জীবনে কাজের স্থায়িত্ব কিংবা স্থিতিশীলতা নেই। যারা বস্তিতে থাকে তাদেরও বৃদ্ধি, পারিবারিক চাপ ও উপরে ওঠার দৌঁড়ে এই অবস্থার এখন ব্যত্যয় ঘটছে।

অর্থনৈতিক চাপ ও প্রলোভন বাড়তে থাকায় ১০ জন সুযোগ পেলে ১০ হাজার জন আশায় তার পিছনে ছুটতে থাকে; একটা মোহগ্রস্ততা তৈরি হয়। ফলে লাগাতার শক্তিশালী আন্দোলন যদি অনুপস্থিত থাকে এবং বিদ্যমান সাংগঠনিক শক্তি যদি দুর্বল হয়, শক্তি সমাবেশের যদি ঘাটতি থাকে, তখন প্রলোভন, মোহগ্রস্ততা অনিশ্চিত জীবনের দুশ্চিন্তা, চিন্তার বিভ্রান্তি ইত্যাদির বাইরে এসে সামাজিক আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত থাকা কঠিন হয়ে ওঠে। একদিকে তত্ত্বগতভাবে নানা বিভ্রান্তি-অস্বচ্ছতা অন্যদিকে, পারিবারিক অর্থনৈতিক চাপ ও ক্যারিয়ার ভাবনা মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয়।

লুটপাট, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক নিপীড়নের কারণে আওয়ামী লীগের ও সরকারের চরিত্র যতটুকু উন্মোচিত হচ্ছে ততটুকু মাত্রায় মানুষের বিকল্পের সন্ধানের মানসিকতাও তৈরি হচ্ছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে বরতে, আওয়ামী লীগ কেন এ জায়গায় গেলো সেটা যেমন মানুষকে

দেখাতে হবে তেমনি তার বিকল্পও দেখাতে হবে। ফলে নতুন ভাবনার যে চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে; জনগণের সামনে সেই ভাবনার মূর্তরূপ ও শক্তি হাজির করতে হবে। জনগণের স্বার্থের পক্ষে আমাদের কাজে থাকতে হবে, বিপ্লবী দলের শক্তিকে সংহত করতে হবে এবং সাংগঠনিক শক্তিকে বিকশিত করতে হবে। এ বিষয়গুলো সম্পন্ন করার জন্য সামগ্রিকতায় অনুসন্ধান করতে হবে। সংগ্রামের অভিজ্ঞতাগুলোকে একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হবে যা যৌথ জ্ঞান ও যৌথ মতামত হিসেবে দলের জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি চেতনাকে একটা দৃষ্টান্তের জায়গায় তুলে ধরতে হবে। দেশে যে পরিস্থিতি চলছে এটাকে চলতে দিলে কর্তৃত্ববাদী শাসন চরম ফ্যাসিবাদে যাবে। চরমভাবে বিভাজিত হয়ে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে অথবা সামরিক হস্তক্ষেপ মানুষ চাইতে পারে। এই অবস্থায় যদি জনগণের শক্তি তথা বামপন্থার শক্তি বিকশিত হতে থাকে তা হলে জনমনে প্রত্যাশা জাগ্রত হবে। বুর্জোয়া বনাম বাম এই দ্বন্দ্বই সমাজকে বিকশিত করবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা, শোষিত শ্রেণির পরাস্ত আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হওয়ার পথ রচনা করবে।

আমরা এ অবস্থাকে কীভাবে মোকাবিলা করবো। গণতন্ত্রের বিকৃত ধারণা, অর্থনীতির ভুল চেহারা তুলে ধরে শাসকরা যে প্রলোভন, মোহগ্রস্ততা তৈরি করে দেখাচ্ছে, সেখানে আমাদের তার বিপরীতে প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে হবে। আদর্শবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে হতাশা বা ভোগবাদিতা থেকে মানুষকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে। যে সংগ্রামী শৌর্য ও ত্যাগে মানুষ দাঁড়াবে তা একটা আদর্শিক উপলব্ধি ছাড়া সম্ভব নয়।

নির্বাচনীব্যবস্থাকে ধ্বংস করে জনপ্রতিনিধিত্বের নামে দেশে গণদখলদারিত্ব কায়েম হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-ঘাট, নদী-খাল, বন, ব্যবসায় দখলদারিত্ব তৈরি হয়েছে। অসচেতনতা, চাকরির স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে জিম্মি দশায় ফেলা হয়েছে। যুব সমাজের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া, উন্মাদনা, লোভ-লালসার মনোভাব তৈরি করে এদের গড্ডালিকার মতো প্রবাহিত করছে।

প্রতিদিন শাসক দলের নানা সংগঠন কোনও না কোনও অপকর্মের সাথে যুক্ত হচ্ছে। তাদের ছাত্র যুবকদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এমন জায়গায় গিয়েছে যে, ক্যাম্পাসের বাইরে নিজের পরিচয় দিতেও তারা লজ্জাবোধ করে। কিন্তু কেন? স্বাধীনতার আগে এদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল মনোভাব ছিল কিন্তু স্বাধীনতার পর এই জাতীয়তাবাদী আবেগ দিয়ে প্রগতিশীল মনোভাব রক্ষা করা সম্ভব নয়। অপরাপর ছাত্র সংগঠনগুলোও পেটিবুর্জোয়া প্রগতিবাদী ধারা রক্ষা করে চলতে চাওয়ার কারণে একটা পর্যায়ের পর আর এগুতে পারেনি। বিএনপির ছাত্র সংগঠন এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। ক্ষমতার প্রশ্রয় ছাড়া এরা দাঁড়াতে পারে না। হতাশা, ক্ষোভ, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা সংস্কৃতির ঘাটতিতে যুব সমাজের মধ্যে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক উগ্রতার ঝোঁকও নীরবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্য চেতনায় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার মনোভাব সঞ্চারিত করা ছাড়া শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে না। সেটা আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

পাকিস্তান আমলে বুর্জোয়া ধারার ছাত্র সংগঠনও ৬ দফা ১১ দফা নিয়ে বিতর্ক করেছে, স্বায়ত্তশাসন নিয়ে বিতর্ক করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এক দেশ দুই অর্থনীতি নিয়ে ক্লাশে আলোচনা করেছেন, বৈষম্য বুঝিয়েছেন। ছাত্ররা এগুলো নিয়ে বাইরে আমতলায়-বটতলায় বিতর্ক করেছে, আলোচনা করেছেন। এখন সে আলোচনা বিতর্ক কোথায়? যারা বুর্জোয়া ছাত্র রাজনীতি করে, গণতন্ত্রের কথা বলে তারা রুশো, ভলতেয়ার, মতেস্কুর ভাবনার সাথে পরিচিত আছে কিনা সন্দেহ আছে। গণতন্ত্রের উদ্‌গাতা কারা, তারা এর মধ্যদিয়ে কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা দেখতে চেয়েছেন এর কিছুর সাথেই তারা পরিচিত নয়। এমনকি তাদের দলের ঘোষিত নীতি, কর্মসূচি, ইতিহাস, ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক কে ছিলেন তার নামটাও অনেকে জানে না।

সংস্কৃতির মান এমন জায়গায় গিয়েছে যে, রীতিমতো তা আশঙ্কার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংস্কৃতিক চর্চা বলতে টেলিভিশন কেন্দ্রিক বিনোদন। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবনচিত্র নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সংস্কৃতির চর্চা হতো সেগুলো এখন আর নেই। সব চলে এসেছে শহর ও টেলিভিশনে। ভারতীয় চ্যানেলগুলেতে যা দেখানো হয় তা খুবই নিম্নমানের রুচির প্রতিফলন। ভালো ভালো আর্ট ফিল্ম এখন আর দেখানো হয় না। বিদেশী ভালো মানের জীবনমুখী সিনেমাগুলোও দেখানো হয় না। সকল ক্ষেত্রেই জীবনমুখী সৃষ্টিশীলতা খুঁজে পাওয়া ভার। ভালো ছবি দেখলে দেখার চোখ সুন্দর হয়, ভালো গান শুনলে শোনার কান সুন্দর হয়, উন্নত সাহিত্য, প্রগতিবাদী রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠে মন-মগজ শুভ-সুন্দর সৃষ্টিশীল ভাঁজে বিন্যস্ত হয়। ক্ষতিকর বিষয়গুলো শিক্ষকরা ছাত্রদের বুঝায় না, শাস্তি দেয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মন গড়তে না পারলে অশুভ অসুন্দরের একক বাজার হয়ে যাবে। এগুলো একচেটিয়া হয়ে গেলে মাঠ পর্যায় থেকে নব নব ভাবনার স্রোতধারা বন্ধ হয়ে যাবে। অতীত অর্জন যাবে আড়ালে, বর্তমান থাকবে ঝাপসা, ভবিষ্যত হবে অনিশ্চিত অন্ধকারময়। সামাজিক মতামতগুলো টেলিভিশনের খাচায় বন্দী রাখলে সামাজিক মতামত গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তাই স্কুলে নাচ, গান, ছবি আঁকা, খেলাধূলা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করার দাবিতে সোচ্চার হতে হবে।

নারী-শিশু নির্যাতনের বর্বরতা প্রতিদিন আমাদের কাছ থেকে সভ্যতার দাবি কেড়ে নিচ্ছে। নারী এবং সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের পরিবর্তে পদায়ন চলছে। এতে ইতিবাচক প্রভাব কিছু হচ্ছে না তা নয়, তবে সামাজিক রাজনৈতিক সংগ্রামের বাইরে রাখলে নারীদের মধ্যে একটা শ্রেণি ভাগ তৈরি হবে। সুবিধাভোগী অংশকে পদায়িত করা হবে। নারী আন্দোলনকে এর মধ্যে আটকে ফেলা হবে। সত্যিকারের লড়াই ছাড়া, নারী-পুরুষের মিলিত লড়াই ছাড়া নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন হবে না। সমাজ বদলের মিলিত লড়াই বর্তমান অবস্থা বদলের পথ রচনা করতে পারে।

শিক্ষার মান আরও ভয়াবহ। মাস্টার্স ডিগ্রি পাস করলেও সাধারণ বিজ্ঞানের ওপর কোন জ্ঞান থাকছে না। গ্রামের স্কুলগুলোতে অঙ্ক, ইংরেজির ভালো শিক্ষক নেই। বামপন্থার রাজনীতি বুঝতে গেলে একটা বিজ্ঞানমনস্কতা লাগে। প্রচলিত শিক্ষায় মানুষের মধ্যে মননশীলতা গড়ে ওঠে না। তার অভাব থাকলে শ্রমিকশ্রেণির দুঃখ দুর্দশা বুঝার মানসিকতাই গড়ে উঠবে না। বিনোদনটা এত স্থূল হয়ে গেছে যে, তার মধ্যে শিক্ষার কিছু নেই। কারিগরি বিষয়ের উন্নতি হলেও জ্ঞান-গবেষণা বা সামাজিক যোগাযোগের বিষয় হিসেবে তার উন্নতি হয়নি। তিন ধারার বহু উপধারার টানাটানিতে শিক্ষাব্যবস্থা বিধ্বস্ত, অতিমারিতে শিক্ষার্থী ধরে রাখা, শিক্ষার পরিবেশ রচনা লোপ পেতে চলেছে, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের বেহাল দশা, উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্গতি দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনকে আরও গভীর ও প্রসারিত করতে হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই আর শোষণ-লুণ্ঠন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইকে একসূত্রে গ্রথিত করে এই কর্তৃত্ববাদী সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোর আন্দোলন শক্তিশালী করা এই সময়ের প্রয়োজনীয় কাজ।